এক অন্য ভাষার গল্পকথা

শান্তনু ভট্টাচার্য

ফিরেছে। নিধি ফিরেছে। নিধির ফিরে আসার খবর এক কান হয়ে আর এক কানে ঢোকা মাত্রই প্রথমে কৌতুহলী তার ঠিক পরেই অস্থির হয়ে উঠল ওর প্রতিবেশিরা। কে প্রথম নিধিকে দেখেছে — এই উত্তর পেয়ে যাবার পর ওরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাল। কেউ ভ্রূ নাচিয়ে ঠোঁটে হাসল। কেউ ছড়িয়ে দিল চওড়া হাসি। কেউ কেউ আবার তাদের কালো ছোপ পড়া ভাঙা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বের করে হে হে করে হাসার পর ওর নাম করে কানে সয়ে যাওয়া একটা-দুটো গালাগালি দিল। হাসি থামার পর কেউ একজন অতি অশ্লীল এক শব্দ ব্যবহার করল ওর আর ওর বৌউকে জড়িয়ে। কত দিন পর নিধি ফিরল? কেউ আবার জড়িয়ে পড়ল সেই হিসাবে। অর্থহীন বিক্ষিপ্ত জমাট বাঁধা সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে কোনো একজন তার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করল, কি রে যাবি তো গল্প শুনতে? চল চল।

নিধি বাড়িতে ঢোকার সামান্য পরেই ওর প্রতিবেশী, শ্যামলাল লেনের অন্তত তেরোজন, যাদের সেই মুহূর্তে পয়সা উপার্জনের জন্য করতে হবে এমন কোনো কাজ ছিল না তারা ওর ঝুঁকে পড়া, মাংস খসে পাঁজর বেরিয়ে যাওয়া সাত ফুট বাই নয় ফুটের ঘরটার দরজায় গিয়ে হাজির হলো।

— কি রে নিধি, ফিরেছিস বাবা! বুড়ো ভীমনাথের কথার উত্তর এলো ঘরের ভিতর থেকে, হ্যাঁ গো মেসো এসেছি। উত্তর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টিনের মরচে পড়া দরজাটা তার শরীর ঘোরানোর সেই 'ভ্যাঁইইই' শব্দটা শুনিয়ে দিল।

দরজায় নিধি বাগ। সবাই নিধির দিকে তাকিয়ে। দশ, এগারো, বারো! নাকি তেরো, চোদ্দো মাস; তার থেকে কি কিছুটা বেশি হতে পারে! সে যাইহোক না কেন, এই সময়ের মধ্যে নিধির তেমন পরিবর্তন হয়নি। গাল দুটো একটু চুপসে যেতে পারে। আর চেহারার পড়তে পারে বোধ হয় একটু কালো ছোপ। তবে মাথার সামনের দিকে চুল একটু পাতলা হয়েছে নিশ্চই।

প্রথমে ভীমবুড়ো তারপর পিছনের আরও কয়েকজন সে-কথা হে হে করে হাসতে হাসতে নিধিকে জানাল।

মাথায় হাত বোলাল নিধি, হতে পারে মেসো। কত দিন হলো বল-না? তারপর যুদ্ধের ব্যাপার।

— যুদ্ধ!

— হ্যাঁ গো; তোমরা জানো না, আমি তো যুদ্ধে গিয়েছিলাম।

— অ্যাঁ! সবাই না হলেও বেশ কয়েকজনের গলা থেকে শব্দটা বেরিয়ে এলো।

— আরে হ্যাঁ গো। আচ্ছা এসো এসো বলছি সব কথা। নিধির ঠোঁটে এমন হাসি যেন এতক্ষণ ধরে ও এই লোকগুলোর জন্যই অপেক্ষা করছিল।

তেরো-চোদ্দোজন চেপেচুপে বসে পড়ল মেঝেতে। নিধিও বসে পড়ল ওদের দিকে মুখ করে। দাঁড়িয়ে রইল শুধু নিধির বৌ।

এর আগের তিনবারেও এই রকমই হয়েছিল। স্বামী এতদিন কোথায় ছিল তা একান্তে নয়, সকলের মাঝখানেই জানতে পেয়েছিল মিনু। বসে পড়ার পর শ্রোতাদের কেউ না কেউ ওই কথাটাই বলেছিল যে কথাটা বিষয় পালটে এখন বুড়ো ভীমনাথ বলল, বল নিধি কীভাবে যুদ্ধে গেলি! কোথায় যুদ্ধ হলো?

বলার সময় ভীমনাথ কথাগুলোর মধ্যে যেমন বিদ্রূপ মিশিয়ে দিল, তেমন যারা নিধির কথা শুনবে বলে ঘরে ঢুকে মেঝেতে পেছন ঠেকিয়েছে তারাও ইতিমধ্যে চোখের পাতায় কৌতুক লাগিয়ে ফেলল।

নিধির মুখে এখন হাসি নেই। গম্ভীর মুখে সেইভাবেই শুরু করল যেমনটি এর আগের বারেও শুরু করেছিল। আসলে, আমি সেখানে পৌঁছিয়ে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ থাকার পরই মনে হলো কিছু একটা ঘটবে। তা আমি এখন এপাশ-ওপাশে দু-এক জনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী? তখন তারা বলল, আজ যুদ্ধ শুরু হবে। সৈন্যরা প্রস্তুত।

— তুই কোথায় গিয়েছিলিস নিধি? শ্রোতাদের মাঝখান থেকে কোনো একজন তার কৌতুহলের রাশ টেনে রাখতে পারল না।

— কিন্তু আমি শুনলাম দেশে সৈন্য নাকি কম। পাশের দেশের সঙ্গে এত বড়ো যুদ্ধ তাতে কম সৈন্য হলে চলবে কেন!

— তুই কোথায় গিয়েছিলিস নিধি, কোন্ দেশে! ভীম বুড়ো নিধির দিকে তাকিয়ে আছে।

.... তখন আমি সেনাপতির কাছে গিয়ে বললাম, আমি যুদ্ধ করতে চাই। সেনাপতি আমাকে ভালো করে দেখে আমাকে যুদ্ধে পাঠাতে রাজি হলো। আমি গেলাম যুদ্ধক্ষেত্রে .....

— কোন্ দেশের সেনাপতি নিধি?

— যুদ্ধক্ষেত্র! সে কি কাছে নাকি, একেবারে দেশের সীমান্তে। পাহাড়, আর পাহাড়। ওরে বাবা, সে কি শীত। পাহাড়ের গায়ে গর্তের মতো বাঙ্কার। দেখি, বড়ো বড়ো কামান গোলা ছোটানোর জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমি যুদ্ধের জামা-প্যান্ট পড়ে বন্দুক নিয়ে তৈরি। অপেক্ষা করছি। হঠাৎ এক সময় আমাদের বলা হলো, হামলা। মানে যুদ্ধ শুরু। ওফ সে কি শব্দ, কি আগুন; তোমরা যদি দেখতে!

— দেখতে গেলে কোন্ দেশে, কোন্ জায়গায় যেতে হবে নিধি? ভীমনাথ বুড়ো মিটিমিটি হাসছে।

— আমি বন্দুক চালাতে শুরু করলাম, ঢ্যাররর্র ..... কিন্তু ভীমমেসো, আমার যুদ্ধ করার শখ মিটে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। ভালোলাগত না আর যুদ্ধ করতে, শুধু মনে হত কী হবে মানুষ মেরে। আমি তো তাই যেদিকে তাক করে বন্দুক ছুঁড়তে বলত, তার এপাশে-ওপাশে বন্দুক ছুড়তাম।

নিধি তার হে হে হাসিটা ফিরিয়ে আনল ঠোঁটে। কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার তা মিলিয়ে গেল ওর ঠোঁট থেকে।

— কিন্তু নিশানার এপাশে-ওপাশে বন্দুক ছোড়ার মধ্যেও একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটা মানুষ; একটা অন্য ভাষার মানুষ। সেই মানুষটাকে আমি একদিন সন্ধের মুখে দেখেছিলাম শত্রুদেশের সীমান্তের দিক থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে হেঁটে আসতে। কিন্তু খুব বেশি ও এগোতে পারেনি। আমার তখন যুদ্ধের নেশা ফিরে এসেছে। একেবারে বন্দুক তাক করে দিলাম তিনটে বুলেট ছুড়ে। তিনটেই বুকে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলাম লোকটা মাটি ছেড়ে উঠে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বুক থেকে কি রক্ত পড়ছে!

— এই রে, আমাদের নিধির মাথার খোপড়ি এবার পুরোপুরি আউট। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কে বলল বোঝা গেল না। তবে এই কথাটার মধ্যেই নিধির বৌ মিনু খোলা জানলা দিয়ে তার দৃষ্টি ভাসিয়ে দিল আকাশে।

— তারপর সেই লোকটা এলো তোর কাছে! ভীমনাথ তার ফোকলা গালে ফুকফুক করে হাসছে।

— হ্যাঁ গো মেসো, এলো!

— তারপর, তারপর ..... সকলের ঠোঁটেই হাসি।

মিনুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

— তারপর লোকটা এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি আবার বন্দুক তাক করলাম। লোকটা হাত তুলে বলল, আর গুলি খরচ কোরো না। আমি তো মরেই গেছি। এবার আমার পরিবারটাও মরে যাবে; আমার মা, বাবা, বৌ। আমার দুটো সন্তান আছে, একটা ছেলে তিন বছরের, আর একটা ছেলে না মেয়ে জানি না, ও এখন আমার বৌ-এর গর্ভে। ওরা সবাই মরে যাবে। আমি ছাড়া যে ওদের খেতে দেবার আর কেউ নেই। লোকটা আরও কী সব বলে যাচ্ছিল, কিন্তু সেগুলো আমার কানে ঢুকছিল না। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। চোখের জল মুছতে দেখলাম লোকটা নেই। কোথায় চলে গেল কে জানে! ভালো করে চোখ মুছে বললাম, শালা যুদ্ধের কাঁথায় আগুন। মেজর, কমান্ডার যেসব লাটের বাঁটের বাচ্চারা সব ছিল সবাইকে দুটো করে খিস্তি মেরে পাহাড় থেকে নেমে পড়লাম। তারপর এপথ-ওপথ ঘুরে চলে এলাম এই তোমাদের কাছে।

বুড়ো ভীমনাথ ও বাকিরা সব ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, এসেই হো হো করে হাসতে শুরু করল। দঙ্গলের মধ্যে থেকে কে একজন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, নিধি এবার মাইরি জব্বর গল্প ফেঁদেছে। আগের বার কি একটা পাখির কথা বলেছিল না, সে নাকি ওর সঙ্গে কথা বলত।

— তার আগের বার প্রজাপতির গল্প শুনিয়েছিল। তারা আবার ওকে নাকি গান শুনিয়েছিল। আর একজনের স্বর শোনা গেল।

— মাথায় ছিট থাকলেও আমাদের নিধি কুমারের গল্প বানাবার গুন আছে। ভেবে ভেবে বানাতে পারে।

— একটু হলেও লেখাপড়াটা তো শিখেছিল। এটা হলো সেই লেখাপড়ার গুণ। কেমন বানায় ভাব!

খোলা আকাশের নীচ দিয়ে দল বেঁধে হেঁটে ফিরতে ফিরতে এ-ও-সে কথাগুলো বলে

গেল। তারপর যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল হাসতে হাসতে।

নিধিও রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল বৌ-এর পাশে।

— তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? মিনু নিধির দিকে তাকিয়ে থাকে।

— যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম, বললাম তো!

— যত মিথ্যে গাঁজাখুরি গল্প। তোমাকে সবাই পাগল বলে তা জানো। এরা কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করে না। তোমাকে নিয়ে হাসে। কথাগুলো বলতে বলতে মিনুর গলা ভেঙে যায়। কথার মধ্যে মিশে যায় কান্না — কেন তুমি এরকম ঘর ছেড়ে চলে যাও, কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাও! আমার কথা তোমার মনে পড়ে না? আমি একা কী করে বাঁচব, ভাবো না তা! কোথেকে এসব গল্প পাও, কেন বলো এসব কথা? পাগল কোথাকার!

মিনুর কথাগুলো ভাসতে লাগল চোখের জলে। আরও কি সব কথা বলে গেল মিনু। কিন্তু সব কথা পৌঁছোল না নিধির কানে। নিধির কাছ থেকে কোনও সারা না পেয়ে একসময় থেমে গেল মিনু এবং পাশ ফিরে চোখ বুজল।

নিধি চোখের পাতা মেলে তাকিয়ে আছে ঘরের চালের বাঁশের কাঠামোয় ঝুলে থাকা কালো নরম ঝুলগুলোর দিকে। ঝুলের জালের ভিতর জমে থাকা অন্ধকারটাকে বোঝবার চেষ্টা করে। এক সময় উঠে বসে বিছানায়। নেমে আসে চৌকি থেকে। দরজার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর নিঃশব্দে দরজা খোলে। খুলেই চমকে ওঠে। রক্তে ভেসে যাওয়া বুক মেলে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অন্য ভাষার মানুষটা।

— একি আপনি এখানে!

— হ্যাঁ, আপনার কাছে এলাম। আপনি যুদ্ধ করতে করতে চলে এলেন! কেন এলেন? এখনও তো যুদ্ধ চলছে।

— আপনি আমার ভাষার কথা বলছেন যে!

— শিখে নিয়েছি। আপনার সঙ্গে কথা বলব বলে। মনের টান থাকলে যে-কোনো ভাষা ক্ষণিকের মধ্যে শিখে নেওয়া যায়। তা যাইহোক, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে এলেন কেন?

— যুদ্ধ এখনও চলছে নাকি!

— যুদ্ধ কি অত সহজে থামে! যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চলবে।

— তাহলে কী হবে!

— কী আর হবে, আমার মতো লোকেরা গুলি খেয়ে মরবে।

— তোমার বুক থেকে তো এখনও রক্ত ঝরছে।

— এ রক্ত কোনওদিন শুকাবে না। আমার শরীরের ভিতর লোহার বুলেট তিনটে এখনও ছুটে বেড়াচ্ছে।

— চলো, ওই রকে গিয়ে বসি। অন্য ভাষার মানুষটাকে সঙ্গে নিয়ে নিধি রকে গিয়ে বসল। কাঁচা রক্তের গন্ধ পাচ্ছিল নিধি। শরীরের সামান্য স্পর্শ পেতেই মনে হলো পাশে থাকা মানুষটার শরীর যেন বরফ দিয়ে তৈরি।

— সে-দিন তুমি পাহাড় পেরিয়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছ দেখে আমি খুব ভয়

পেয়েছিলাম। আমি মরতে খুব ভয় পাই।

— আমার হাতে সেদিন কোনও অস্ত্র ছিল না। আমি তোমাকে মারতে যাইনি।

— তাহলে তুমি আমার কাছে যাচ্ছিলে কেন?

— পাহাড় ডিঙিয়ে নিজের দেশের সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে বহু কষ্টে রাতের বেলায় তোমাদের সীমান্তে ঢুকে পড়েছিলাম। আমার দেশের, যারা আমার মতো গরিব মানুষ, তারা কেউ যুদ্ধ চায় না। সে-কথা বলার জন্যই তোমাদের সীমান্তে গিয়েছিলাম। পাহাড়ে ঝোপের আড়ালে থেকে কিছুক্ষণ যুদ্ধ দেখার পর মনে হলো তোমাকেই আগে কথাটা বলা যায়। কারণ তুমি তো ঠিকঠাক যুদ্ধ করেছিলে না। তুমি কি আমার কথা শুনে তোমার মেজরকে বলো .....

— আমি বুঝতে পারিনি। আমার যে খুব মরার ভয়!

— জানো সৈনিক, আমার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান ছিল সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যেদিন আমার বুকে গুলি লাগল সে দিনকেই। ছেলে বড়ো হয়ে আমায় ছবিতে দেখবে।

— আমার কোনও সন্তান নেই। ওই যে দেখো ঘরের ভিতর আমার বৌ ঘুমাচ্ছে। ওকে আমি কোনও সন্তান দিতে পারিনি। পারবও না। .... তোমার সদ্য হওয়া ছেলেটাকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।

— তোমার পক্ষে তো আমার বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয় সৈনিক। সে তো অন্য দেশ, অন্য স্থান।

— এর আগের বার যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম তখন একদিন এক নদীর ধারে ভবঘুরেদের ছাউনিতে আমি রাত কাটিয়েছিলাম। মাঝরাতে খুব শীতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। হঠাৎ দেখি কুয়াশা আর অন্ধকারের ভিতর থেকে কি একটা নেমে এলো আমার কাছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি একটা পাখি! ঘন নীল পালক তার শরীরে। পাখিটা আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ মানুষের মতো বলে উঠল, খুব শীত করছে? এসো আমার কাছে। আমার শরীরে খুব তাপ, তোমার শীত চলে যাবে। আমি কোনোক্রমে খরের ছাউনি থেকে নেমে কয়েক পা তার দিকে এগোতেই মনে হলো শীতের কষ্ট কমে আসছে আমার। পাখিটা এক পা এক পা করে, অল্প ডানা ঝাপটিয়ে হেঁটে, লাফিয়ে এগোচ্ছিল। আমি চেষ্টা করছিলাম ওর কাছাকাছি থাকার। শীতের কষ্ট খিদের কষ্টের মতো। তাই দ্রুত পা চালাচ্ছিলাম। আমার চারপাশে তাপ বাড়ছিল। নীল পাখিটা আমাকে একেবারে নদীর ধারে নিয়ে গেল। তারপর বলল, নিজের ঘরে ফিরে যাও। সেখানে অনেক তাপ জমে রয়েছে। তোমার শীত থাকবে না। পাখিটা আরও কি সব বলেছিল, আজ আর আমার খেয়াল নেই। আসলে আমি তো কোনো কিছুই ঠিকঠাক মনে রাখতে পারি না। মাথার মধ্যে যে কত কি হয়। কি করি, কোথায় যাই, কেন যাই! কিচ্ছু না!

— আপনি কিন্তু খুব সুন্দর গল্প বলেন সৈনিক।

— আমাকে সৈনিক বোলো-না। আমি সৈনিক নই, আমি নিধি, নিধি বাগ। এই শ্যামলাল লেনে থাকি। আমার বাবাও এখানে থাকত। আমার বাবার কাছ থেকেই আমি গল্প বলা শিখেছি। বাবাও খুব ভালো গল্প বলত। কিন্তু বাবার কথাও আমি এক এক সময় ভুলে যাই। যখন অনেক

কিছু ভুলে যাই তখন রাস্তাটাই আমাকে টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে, আমি হারিয়ে যাই। তারপর আবার হঠাৎ একটা দুটো কথা মনে পড়ে; এক সময় সব মনে পড়ে, তখন ঘরে ফিরে আসি। কেন এরকম হয় বলো তো?

— কোনো কোনো মানুষের বেলায় এরকম হয়। তারা ঘরে থাকতে পারে না। আবার কিছু কিছু মানুষ ঘর থেকে বের হতেই চায় না। ঘরটাই তাদের সব, যেমন আমি। আমার ঘরের লোকগুলোর মুখ না দেখে আমি থাকতেই পারতাম না।

— আমি ভয় পেয়ে তোমার দিকে তিনটে গুলি চালিয়ে দিয়েছিলাম। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার যে খুব মরার ভয়। খুব ভুল হয়ে গেছে আমার। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

— সয়ে গেছে।

— আমারও খুব কষ্ট হয়। আমি যে হঠাৎ হারিয়ে যাই, তারপর ফিরে আসি, এসে আমার অভিজ্ঞতা বলি লোকজনকে, তারা বিশ্বাসই করে না, আমাকে পাগল ভাবে; তাতে আমার বউ কাঁদে। আসলে হঠাৎ হঠাৎ কী সব ঘটনা ঘটে যায় আমার জীবনে— যখন সেগুলো ঘটে তখন আমার চারপাশে আলো থাকে না। সেগুলোই তো সব কথা হয়ে গলা থেকে বেরিয়ে আসে।

— এরকমটা হয় কারুর কারুর জীবনে।

— একবার কী হয়েছিল, আমি একটা বস্তির রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। খুব নোংরা, আমাদের এই শ্যামলাল লেনের থেকেও নোংরা। পাশে ড্রেন, পচা গন্ধ বের হচ্ছিল। খুব রোদ, দুপুরবেলা। আমি আপন মনে হাঁটছিলাম। খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু পয়সা নেই। হঠাৎ কোত্থেকে অনেকগুলো টকটকে লাল রঙের প্রজাপতি এসে আমার চারপাশে উড়তে শুরু করল। তারপর গান গাইতে শুরু করল। আমি খিদের কথা একদম ভুলে গেলাম। পরে বাড়ি ফিরে এ পাড়ার লোকেদের প্রজাপতির গল্প বলেছিলাম। কিন্তু কী হবে বললে, ও হারামির বাচ্চারা আমার কথা বিশ্বাস করল। গাধা গরুরা কি মানুষের কথা বিশ্বাস করে।

— সুন্দর করে কথা বলতে পারাটা খুব ভালো। আমি যেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। বলতে পারলে তোমার সঙ্গে আরও গল্প করতাম। আজ আমায় যেতে হবে। আবার পরে আসব। বারবারই আসব!

নিধি দেখল, অন্য ভাষার সেই লোকটা রক থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছে শ্যামলাল গলির সরু নোংরা পথ ধরে। এখানে-ওখানে পিচের স্তর উঠে যাওয়া রাস্তাটার শরীরে ওপর থেকে নেমে আসা তামাটে আলোয় লোকটার ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে। মাঝরাতের ফিনফিনে কুয়াশার ভিতর ক্রমেই ছোটো হয়ে যাচ্ছে অন্য ভাষার লোকটা।

রক থেকে নেমে লোকটার হেঁটে যাওয়া পথ ধরেই হাঁটতে শুরু করল নিধি। বেশ দ্রুত। চেষ্টা করল লোকটাকে ধরবার। হাত তুলে গলা হাঁকিয়ে ডাকল, ও ভাই দাঁড়াও না একটু।

লোকটা আরও ছোটো হয়ে তখন শ্যামলাল লেন নামের গলি রাস্তার প্রান্তে। থামল না লোকটা।

হাঁটার গতি কমিয়ে আনল নিধি। মাপা পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে ওপরে তাকিয়ে দেখল

একটা নীল পাখি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। তার সঙ্গেই উড়ে চলেছে অনেকগুলি ঘন লাল প্রজাপতি।

মাথা তুলে পাখি আর প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল নিধি। হো হো করে হাসতে হাসতে পেরোতে লাগল শ্যামলাল লেন। ওর হো হো হাসির শব্দ কুয়াশা আর বাতাসের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খানিক দৌড়ে নিল গলির ভিতর। নীল পাখি ও ঘন লাল প্রজাপতিরা উড়ে উড়ে এগোতে লাগল নিধির সঙ্গে। হা হা হো হো করে হাসতে হাসতে নিধি শ্যামলাল লেন পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়ল। হাসতে হাসতে মাথা নীচু করে শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা নিজের ছায়াটাকে দেখল। পরমুহূর্তেই মাথা তুলল। উঁচু পোষ্টের ওপর থেকে নেমে আসা সোনা-রঙের আলো, তার ওপর পাপ-রঙের অন্ধকার, তার ওপর স্বপ্ন-রঙের আকাশ। নিধির দৃষ্টিতে এগুলোর বাইরে আর কিছু নেই।

নিধি ঘাড় ঘুরিয়ে মাথার ওপর নীল পাখি আর ঘন লাল প্রজাপতিদের দেখার চেষ্টা করল। কোথায় ওরা! হাসি থেমে গেল নিধির। ক্ষনিকের জন্য হাঁটা থামিয়ে নিধি ডানে-বায়ে, ওপর-নীচে দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টি ঘোরাল। দৃষ্টিতে অনেক কিছুই আছে, শুধু ওরা নেই।

নিধি হাঁটা শুরু করল। হাঁটতে থাকল। হাঁটতেই থাকল। পিছনে পড়ে রইল শ্যামলাল লেন। হাট হয়ে খোলা রইল সাত ফুট বাই নয় ফুট ঘরের দরজাটা। সেখানে ফিরে ঘরে ঢুকে পড়ছে ফিনফিনে ধূসর কুয়াশা।